ঢাকা টাইমস
www.dhakatimes24.com

বাকশাল নিয়ে সব বক্তব্য কি সত্য? ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান

প্রকাশ | ১৪ জুলাই ২০২২, ১০:৩২ | আপডেট: ১৪ জুলাই ২০২২, ১২:০৮

মারুফ রসূল

বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে 'বাকশাল' সম্ভবত সবচেয়ে সংবেদনশীল শব্দ। দীর্ঘ সাড়ে চার দশক ধরে এই শব্দটি নিয়ে রাজনীতি করে যাচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এবং তাদের তল্পিবাহক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীরা। এমনকি, যাঁরা প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁরাও জেনে বা না-জেনে বাকশাল সম্পর্কে নানা ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে থাকেন। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যতগুলো গবেষণা হয়েছে বা বইপত্র লেখা হয়েছে-সব কটিতেই বাকশালকে কমবেশি 'একনায়কতন্ত্রের ব্যবস্থা' হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কিসের ভিত্তিতে, কোন কোন নথি বা ঐতিহাসিক দলিল পর্যালোচনা করে তারা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন, তার কোনো উল্লেখ নেই।

আমার মতো নব্বই দশকে বেড়ে ওঠা অনেকেই 'বাকশাল' শব্দটি শুনেছেন কার্যত একটি রাজনৈতিক গালি হিসেবে। বাংলাদেশে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে ইতিহাস বিকৃতির যতগুলো অপকর্ম ঘটেছে-বাকশাল তার মধ্যে একটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ইতিহাস বিকৃতির অন্য সব বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও দলগুলো যতটা সোচ্চার থেকেছেন, বাকশাল নিয়ে তা থাকেননি। বরং ইতিহাসবেত্তা অনেক প্রণম্যজনও এ বিষয়ে নীরব থেকেছেন, নাহলে দু-একটি দায়সারা বক্তব্য দিয়ে এড়িয়ে গেছেন।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে বাকশাল এক বছরও স্থায়ী হয়নি। মুক্তিসংগ্রামের দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের অংশ হিসেবে যে বাকশাল কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তা বাতিল করে দিয়েছিল তৎকালীন খুনি সরকার।
একপেশেভাবে বাকশাল সমর্থনের জন্য আমি এ লেখাটি লিখছি না; বরং শৈশবের, এমনকি তরুণ বয়সের নানা অভিজ্ঞতার আলোকেই আমি অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়েছি-প্রকৃত অর্থে বাকশাল কী ছিল, সেটা জানার। স্বীকার্য, এ-বিষয়ক নথিপত্র একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। বাকশালের গঠনতন্ত্রটি পাওয়া গেলেও, প্রাসঙ্গিক আরও নানা দলিলপত্র আমাদের আর্কাইভে বা লাইব্রেরিগুলোতে নেই-অন্তত আমি খুঁজে পাইনি। তবে সে সময়ের সংবাদপত্রগুলো এখনো পাওয়া যায় এবং তা থেকে বাকশালব্যবস্থাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নানা জরুরি উৎসের সন্ধান মেলে। এ ছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দলিলপত্র এবং রাষ্ট্রীয় কিছু নথিপত্র পর্যালোচনা করেই বাকশাল বিষয়ে একটি তাত্ত্বিক ধারণা দাঁড় করানো যায়। বস্তুত তথ্যের এ উৎসগুলোর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকেই বাকশালের স্বরূপটি উদ্ঘাটন সম্ভব।

বাকশালব্যবস্থা প্রণয়নের প্রেক্ষাপট

প্রেক্ষাপট বলতে আনুপূর্বিক ইতিহাসের সে পর্যালোচনা বোঝায়-এ ছোট্ট পরিসরে সেটা সম্ভব নয়। তারপরও তৎকালীন রাজনৈতিক মঞ্চের বিভিন্ন কুশীলব এবং তাদের দৃশ্যায়নগুলোর ধারাবাহিকতা থেকে আমি বাকশাল প্রণয়নের প্রেক্ষাপটটি এখানে তুলে ধরছি। তবে একই সঙ্গে এটা জানিয়ে রাখা ভালো, এ কেবল প্রেক্ষাপট আলোচনার জন্যই নয়, বরং বাকশালব্যবস্থার দিকে তৎকালীন বাংলাদেশ কীভাবে এগিয়ে গিয়েছিল বা প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্বের বিপরীতে কেন বাকশালব্যবস্থাটি প্রণীত হয়েছিল, তার যৌক্তিকতাও পাওয়া যাবে।

আমাদের ইতিহাস অভিজ্ঞানে যদি সততা থাকে, তবে এ সত্য স্বীকার করতেই হবে-মুজিবচরিতমানসের রাজনৈতিক ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে ওঠা প্রধানতম শিল্পটির নাম গণতন্ত্র। তাঁর রাজনৈতিক মনস্বিতার পরিচয়পত্র যদি হয় জনগণ, তবে তার সবার্থসাধক বিকাশের নাম গণতন্ত্র। কি সংগঠন পরিচালনা, কি সরকারব্যবস্থা-প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতন্ত্রই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এমনকি যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সংগঠনের ভেতরে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব।

তবে রাষ্ট্র ও রাজনীতিবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের যে তাত্ত্বিক কাঠামোগত ধারণাটি পাওয়া যায়, বঙ্গবন্ধুর চর্চিত ও কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের স্বরূপ, আমার মতে, তা থেকে খানিকটা সম্প্রসারিত-ভিন্ন নয়, সম্প্রসারিত। এ কথা তাঁর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবহুল স্তর-উপস্তরগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বঙ্গবন্ধু যে প্রতিবেদনটি পেশ করেছিলেন, তাতে গণতন্ত্রের প্রশ্নে তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তাতে নতুন কোনো তত্ত্ব বা ধারণা না থাকলেও, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সামগ্রিক সংগ্রামের লক্ষ্য ও ইতিহাস বর্ণনার সময় রাজনীতিতে গণতন্ত্রের অংশগ্রহণকেই তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়ন করেছিলেন; এবং আমার মতে, এটিই ছিল ওই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশ। ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূর্যমুখী নেতৃত্বে বাংলার মানুষের মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু গণতন্ত্র প্রসঙ্গে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও অর্থনীতির যে ভূমিকাপত্র ১৯৬৪ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি পেশ করেছিলেন, তার একটি সম্প্রসারিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা পাই মুক্তিযুদ্ধের পর-স্বাধীন বাংলাদেশে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংজ্ঞায়িত গণতন্ত্রের ধারণাকে আত্তীকরণের মাধ্যমেই তিনি এই অঞ্চলের মানুষের জন্য 'শোষিতের গণতন্ত্র' ধারণাটির অবতারণা করেছিলেন।

কেবল ভোটাধিকার, সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার দায়-দায়িত্বহীন বিস্তৃতি আর ক্যালেন্ডার গুনে নিয়মিত নির্বাচন হলেই যে সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না, বা হলেও সেটা টেকসই হয় না, এ সত্য গত শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশটি বছরের ভূরাজনৈতিক ইতিহাস পড়লেই জানা যায়। অন্ধের

হাতি দেখার মতো এই উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্র সরকারব্যবস্থা হিসেবে পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। না তাতে সংযোজিত হয়েছে স্থানীয় জন-আকাঙ্ক্ষা, না তার সম্প্রসারণ ঘটেছে স্বদেশিয়ানায়, না তা রূপান্তরিত হয়েছে দেশকালের জনভাষ্যে। ইতিহাস সাক্ষী-গণতন্ত্রকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়েই এ উপমহাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, বিদেশি রাষ্ট্রের বৈরী স্বার্থের অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে, শান্তিরক্ষার নামে আধিপত্যবাদের বৈধতা দেওয়া হয়েছে, সামরিক ও মোল্লাতন্ত্রের নির্মম-নগ্ন বিস্তার ঘটেছে এবং দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিদেশি এজেন্ট তৈরি হয়েছে।

এ কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশে গণতন্ত্রচর্চার ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়-জনসম্পৃক্ততা, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের আদর্শ বা সংগ্রাম ছাড়াও কিছু বিষয় এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং সময়ের সঙ্গে আজ সেগুলো গণতন্ত্রচর্চার অনিবার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। অবৈধ পুঁজি, বহিঃশক্তির স্বার্থবাদী অনুপ্রবেশ, ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের রক্তাক্ত ভেদাভেদ, দূতাবাসের দূতিয়ালি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অসাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ, ক্ষমতালোভী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, রাজনীতিতে ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দিসমাজের নিয়মনীতিহীন অংশগ্রহণ এবং দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে-এগুলোকে এখন আর আলাদা করা যায় না। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐতিহাসিক অবদান রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার জন্ম হলেও বঙ্গবন্ধু ছাড়া উপমহাদেশের আর কোনো নেতা তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকভাবে গণ-মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেননি।

স্বাধীন দেশের গণ-পরিষদেই ‘শোষিতের গণতন্ত্র’ কথাটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে স্পিকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংবিধান বিলের (গৃহীত) ওপর প্রধানমন্ত্রী ও গণপরিষদের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। দীর্ঘ এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন-

“...আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। মানুষের একটা ধারণা এবং আগেও আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র যেসব দেশে চলেছে দেখা যায় সেসব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের চৎড়ঃবপঃরড়হ দেওয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সে গণতন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র এবং সেই শোষিতের গণতন্ত্রের অর্থ হলো, আমার দেশে যে গণতন্ত্রের বিধিলিপি আছে, তাতে যেসব Provision করা হয়েছে, যাতে এ দেশের দুঃখী মানুষ Protection পায়, তার জন্য বন্দোবস্ত আছে-ঐ শোষকরা যাতে Protection পায়, তার ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আছে।”

বক্তব্যটি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি, প্রচলিত পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নয়; বরং এ দেশের মানুষের জন্য স্বদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও জনমানসিকতার সম্মিলনে একটি স্বাদেশিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধ ছিল শোষণহীন, বৈষম্যহীন ও মানবিক মর্যাদার সমাজ বিনির্মাণের এক অনন্য মহাসংগ্রাম। যে গণতন্ত্রের লেবাসে পাকিস্তান দীর্ঘ ২৩ বছর বাংলার মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, স্বাধীন দেশে ত্রিশ লক্ষাধিক শহীদের রক্তে ভেজা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে এক লহমায় তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন জাতির জনক। পরিবর্তে তিনি প্রণয়ন করেছিলেন শোষিতের গণতন্ত্রব্যবস্থার বীজমন্ত্র-গত শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ইতিহাসে যা ছিল এক নতুন সংযোজন।

তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশ এমন একটি অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয়-যার খাদ্যের জন্য পরনির্ভরতা, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আর কর্মহীন ছিন্নমূল মানুষের আপেক্ষিক গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। গ্রামীণ দারিদ্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের রপ্তানি আয় নেমে এসেছিল একেবারে শূন্যের কোঠায়; অন্যদিকে স্থায়ী সম্পদ আহরণের ক্ষমতা হয়ে পড়েছিল ভয়াবহভাবে সংকোচনশীল। তার ওপর ছিল যুদ্ধফেরত, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত আর স্বজন হারানো অগণিত মানুষের মানসিক অস্থিতিশীলতা আর চূর্ণ-বিচূর্ণ রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো।

১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সরকারের ১৩১৪ দিনের কার্যকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর সরকারকে যে ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারগুলোর তুলনায় তা ছিল প্রায় পর্বতসম। যেকোনো সরকার সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগায়। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকেই ঢেলে সাজাতে হয়েছিল। অগোছালো পুলিশ বাহিনী, অসংগঠিত রাইফেলস বা আধা সামরিক বাহিনীগুলোর সদিচ্ছা থাকলেও রাষ্ট্র গঠনের কাজে নিজেদের সক্ষমতাকে তারা সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে-এমন নজির অন্তত আমার কাছে নেই।

বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিলেও সবাই যে সে নির্দেশ পালন করেছিল, তা বলা যায় না। তার ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর ফেলে যাওয়া প্রচুর অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার, শান্তিকমিটি ও চীনপন্থী বিভ্রান্ত বিপ্লবীদের নানা দল-উপদল রাষ্ট্রে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি শুরু করেছিল। দেশের বেশ কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানা নামে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে এরা বিরোধিতা করেছিল; বিশেষ করে পিকিংপন্থী বিভ্রান্ত বামধারার সশস্ত্র বিভিন্ন দল-উপদল, যারা স্বাধীন দেশে প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্র প্রদর্শন, লুটপাট, থানা ও ফাঁড়িতে হামলা ইত্যাদি অপরাধের সঙ্গে গুপ্তহত্যাও শুরু করেছিল। নিঃসন্দেহে এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্তৃত্বের প্রতি ছিল একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লুট হয়েছিল প্রায় ১৯টি থানা ও ফাঁড়ি। স্বাধীনতার প্রথম বছরে ৩৩৭টি ছিনতাই, প্রথম ১৬ মাসে ২৩০৫টি গুপ্তহত্যা এবং প্রথম দুই বছরের মধ্যেই ৪৯০৭টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল । এসব গুপ্তহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশকে বিপদে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। আর সেটা করেছিল বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার দালালরা।

এ ধরনের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বারবার সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করেছিলেন। তিহাত্তরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া নানা বক্তব্য ও ভাষণ পড়লে দেখা যায়-বাংলাদেশের প্রশ্নে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর কাছে তিনি একদিকে যেমন শর্তহীন সহযোগিতা দাবি করেছিলেন, তেমনি জনগণকেও সতর্ক করেছিলেন রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ওত পেতে থাকা বিদেশি অনুচরদের বিষয়ে।

বিদেশি অনুচরদের সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায় ১৯৭৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীতে। সংসদ সদস্য আবদুল কুদ্দুস মাখন একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব তুলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন-সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক আসলাম কীভাবে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তান পালিয়ে গেল। এ প্রশ্নের সূত্র ধরে সেদিনের সংসদ আলোচনার কার্যবিবরণী পাঠ করলে জানা যায়-সাংবাদিক হওয়ার কারণে পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়াই আসলামকে পাসপোর্ট সরবরাহ করা হয়েছিল। ওই পাসপোর্ট নিয়েই আসলাম প্রথমে লন্ডন এবং পরে সেখান থেকে পাকিস্তান চলে যায় । আসলাম ছিল পাকিস্তানের নাগরিক। ১৯৬৫ সালের ১ আগস্ট হলিডে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই সে পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতনের পর হলিডে পত্রিকাই হয়ে উঠেছিল পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অন্যতম প্রচারযন্ত্র। স্বাধীন দেশে আসলাম পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বসবাস করত, হলিডে পত্রিকায় চাকরি করত আর পাকিস্তানের পক্ষে বিভিন্ন সংস্থার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করত। এ বিষয়ে মওলানা ভাসানী একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছিলেন। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাত্র পাঁচ দিন আগে (২ মার্চ ১৯৭৩) গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'বিদেশী চক্রান্তকারীরা বাংলাদেশে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে অস্ত্র পাঠাচ্ছে।...বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য ভুট্টো প্রতি মাসে ২৬ লাখ টাকা ব্যয় করে।' তবে এ টাকা কোন কোন খাতে খরচ হয়েছিল আর কার কার পকেটে ঢুকেছিল, সেটা মওলানা সাহেব না বললেও তৎকালীন রাজনৈতিক দৃশ্যপট ও নথিপত্র থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একেবারে প্রস্তুতিপর্ব থেকেই গুজব ও ভারতবিরোধিতা তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনীতির অন্যতম একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন রাজনীতিতে গুজব প্রচারের দৌড়ে জাসদ কখনোই পিছিয়ে ছিল না, বরং নথিপত্র দেখলে মনে হয় যেন খানিকটা এগিয়েই ছিল। এর প্রধান কারণ হতে পারে,

জাসদের মূল-নেতৃত্ব ছিল তারুণ্যনির্ভর। ফলে নতুন ও চমকপ্রদ তথ্য প্রদানের ছুতোয় দলটি কার্যকরভাবে গুজব সরবরাহ করতে পারত এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেগুলো প্রকটভাবে ছড়িয়েও পড়ত। তা ছাড়া এগুলোর আন্তর্জাতিক দরও কম ছিল না।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে জাসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব গুরুতর কয়েকটি মিথ্যাচার বা গুজব ছড়িয়েছিলেন। 'আমি শুনেছি', 'আমাদের কাছে খবর আছে' ইত্যাদি ভিত্তিহীন কিছু সূত্র উল্লেখ করে একদল দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমকর্মীর সামনে তার অভিযোগ ছিল-বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও বঙ্গোপসাগরে বিদেশি সৈন্য আছে এবং রক্ষীবাহিনীতে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সৈন্য আছে । এমন ভিত্তিহীন বক্তব্য কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার হতে পারে না।

এগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র আর আধিপত্যবাদী সেনা-মনস্তত্ত্ব তো ছিলই। এ বিষয়ে যথোপযুক্ত একটি মূল্যায়ন ছিল ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রকাশিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের একটি অংশে-

'উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা একটি দুর্নীতিযুক্ত প্রশাসন পেয়েছি। সাবেকী পুঁজিবাদী অর্থনীতির সূত্র ধরে আমাদের জীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং আমাদের প্রশাসন কর্মীদের কিছু অংশ এখনও পুরাতন রীতি-নীতি ও ভাবধারা পরিত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীল লোভ-লালসাহীন কর্তব্যনিষ্ঠার প্রমাণ দিতে পারেনি।'

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সুযোগ পেয়েছিল মাত্র ১৩১৪ দিন। এটুকু সময়ের মাঝেই তাঁকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের এমন এক দর্শন, যার সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়, বরং এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের সংযোগ রয়েছে। তাঁকে খুঁজতে হয়েছে এমন একটি সামাজিক সাম্যাবস্থার রাজনৈতিক পন্থা, যার সঙ্গে এ দেশের মানুষের জীবনসংগ্রাম সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর বাস্তবায়নে তাঁর সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছিল তাৎক্ষণিক ও জরুরি নানা উদ্যোগ, নিতে হয়েছিল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নবিষয়ক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানা পদক্ষেপ। আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে শূন্য অবস্থা থেকে ভবিষ্যতে একটি টেকসই ও স্বনির্ভর উন্নয়নের স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাগুলোও তৈরি করতে হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী-তাঁর এ যাত্রাপথটিও নিষ্কণ্টক ছিল না। ছিল না কারণ, বুলিসর্বস্ব গণতন্ত্রের চটকদারি বটিকা তো তিনি জনগণকে গেলাতে চাননি। আর প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা একটি নতুন রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠতে পারে না। এ কারণেই তিনি এগিয়েছিলেন বাকশালব্যবস্থার দিকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর বাকশালই ছিল বাংলার মানুষের আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র কবচকুণ্ডল-এ আমার নিছক বক্তব্য নয়, প্রামাণ্য উপলব্ধি।

আদর্শিক ভিত্তি, রাজনৈতিক ঐক্য ও বাকশাল

বাকশাল কোনো হঠাৎ-আবির্ভূত ব্যবস্থা ছিল না। এমন নয় যে তৎকালীন সরকার রাতারাতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বাকশালব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা শুরু করে দিয়েছিল। 'বাকশাল' একটি নাম মাত্র-কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার যে পরিকল্পনা ও পদ্ধতি এ নামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সূত্রপাত আরও আগে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সবার সমন্বয়ে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ বাহাত্তরের পর থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ ততটা প্রকাশ্য না হলেও, রাজনীতির ক্ষেত্রে একেবারে শুরু থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল। দেশ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্য বা জাতীয় সরকারের কথা তুলেছিল। দেশের তৎকালীন নানা সংকট সমাধানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কর্মীরাও বহুবার রাজনৈতিক সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু ঐক্যের এ আলোচনাটি রাজনৈতিক বৃত্তে যতখানি সক্রিয় ছিল, প্রশাসনিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা দৃশ্যমান ছিল না। আবার এ ঐক্য বা রাজনৈতিক সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি ঠিক কী হবে, এর ভিত্তি কী হবে-সে সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত কিন্তু বাকশাল প্রতিষ্ঠার আগে আমরা পাই না। একমাত্র বাকশালব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই এ ক্ষেত্রে একটি সার্বিক সমন্বয় তৈরি হয়েছিল।

আমাদের মুক্তিসংগ্রাম যেমন ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি চূড়ান্ত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল; বাকশালব্যবস্থার প্রবর্তনও তা-ই-স্বাধীনতা-পরবর্তী নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৭৫ সালে এর খসড়া কাঠামোটি চূড়ান্ত হয়েছিল। পার্থক্য শুধু এটুকুই-মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের উপসংহার; কিন্তু বাকশাল ছিল মুক্তিসংগ্রামের আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনার ভূমিকাপত্র। পরবর্তী সময়ে সংযোজন-বিয়োজন-সম্প্রসারণ বা বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে হয়তো সময়ের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিকভাবে একে আরও পরিপূর্ণ করে তোলা যেত। কিন্তু সে সুযোগটি বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া হয়নি।

তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যারা নিজেদের মুক্তিসংগ্রামের আদর্শপন্থী হিসেবে দাবি করত, তাদেরই একটি বড় অংশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে ছিল আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুবিরোধিতা। তাদের সঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধী নিষিদ্ধঘোষিত দলগুলো তো ছিলই। ফলে সে সময়ের রাজনীতিতে আদর্শিক ঐক্য খুঁজতে গেলে আমাদের সামনে আসে গণ-ঐক্যজোট, এবং এটি মুক্তিযুদ্ধের পরপরই গঠিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ের ইতিহাস আলোচনায় গণ-ঐক্যজোট বা ত্রিদলীয় ঐক্যজোট সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা পাওয়া যায় না। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল (১৫ আগস্ট) পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সরকারের ইতিহাস আলোচনায় খানিকটা সাল-তারিখের দায় মেটাতেই গণ-ঐক্যজোটের প্রসঙ্গটি আসে। ফলে এ জোট প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সীমাবদ্ধ থাকে তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দিন-তারিখের বৃত্তে। কিন্তু সে সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসে আদর্শের ধারা এবং মেরুকরণটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গণ-ঐক্যজোট গঠনের মধ্য দিয়ে। বলা যায়-এ গণ-ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠাই ছিল বাকশালের সূচনাবিন্দু।

১৯৭২ সালের মে মাসেই (২৯ মে: সোমবার) এ ধরনের একটি জোট গঠনের বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং সিপিবি-তিনটি রাজনৈতিক দলের আলোচনা শুরু হয়েছিল। সময়টি লক্ষ রাখা প্রয়োজন-বাহাত্তর সালের মে মাস, অর্থাৎ তখনো সংবিধান প্রণীত হয়নি। এ জোট গঠনের ক্ষেত্রে ন্যাপের (মোজাফফর) সভাপতি জানিয়েছিলেন, 'মন্ত্রিসভার স্তর ছাড়া সকল স্তরেই আমরা সরকারকে সমর্থন দেব।'

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের কথায় এটা স্পষ্ট যে ন্যাপ (মোজাফফর) বা সিপিবি ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়নি, তারা চেয়েছিল নবগঠিত রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকারের পাশে থাকতে। দলগুলোর পরবর্তী কার্যক্রমেও নেতৃবৃন্দের এ বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়। নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো জোট গঠন করেনি, আর আওয়ামী লীগও এককভাবে নির্বাচন করেই পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় এসেছিল।

১৯৭৩ সালের গোটা সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে গণ-ঐক্যজোট নানামুখী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও চূড়ান্ত কোনো যুক্ত ঘোষণা তখনো প্রণীত হয়নি। অর্থাৎ কর্মসূচিভিত্তিক বিভিন্ন বিবৃতি এলেও, সার্বিক রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা তখনো আসেনি। চূড়ান্ত কোনো যুক্ত ঘোষণা না এলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে গণ-ঐক্যজোট অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী), বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিসহ প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলগুলো আগে বক্তব্য-বিবৃতিতে 'শেখ মুজিব গং' কথাটি ব্যবহার করত; গণ-ঐক্যজোট গঠনের পর 'শেখ মুজিব, মোজাফফর, মণি সিংহ গং' শব্দমালা তাদের বক্তব্য-বিবৃতিতে যুক্ত হয়েছিল।

অবশেষে গণ-ঐক্যজোটের চূড়ান্ত যুক্ত ঘোষণাটি আসে ১৯৭৩ সালের ১৪ অক্টোবর (রবিবার)। পরবর্তী সময়ে প্রবর্তিত বাকশালব্যবস্থাটি বুঝতে গণ-ঐক্যজোটের এ যুক্ত ঘোষণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘোষণার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের তৎকালীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় বিরাজমান সংকটগুলো ঠিকঠাক চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সেগুলো সমাধানের কার্যকর রাজনৈতিক ও দলীয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও সবিস্তারে আলোচনা লিপিবদ্ধ ছিল। প্রশাসনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা সমূলে উৎপাটন করে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যরোধে রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো এতে সুস্পষ্ট করা হয়েছিল। রাজনীতিকে আদর্শিক, শক্তিশালী, স্বনির্ভর ও গণমুখী করতে না পারলে নির্বাচনব্যবস্থায় জনগণ ও রাজনৈতিক দলের বাইরে তৃতীয় পক্ষের সমাগম ঘটে। ফলে সফলভাবে নির্বাচনি বৈতরণী পার হয়ে সরকার গঠন করলেও সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের ওপর সংবিধানস্বীকৃত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণটি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ ধরনের

রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও নিজের কণ্ঠস্বর ধরে রাখতে পারে না। গণ-ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ বিষয়গুলো ঠিকঠাক বুঝেছিলেন বলেই চূড়ান্ত যুক্ত ঘোষণায় মুক্তিসংগ্রামের আদর্শিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজনৈতিক বলয়কে শক্তিশালী করার বিষয়ে তাঁরা গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

গণ-ঐক্যজোট গঠনের পরপরই প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দলগুলো এ জোটকে কখনো ভারত বা সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার কখনো যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার হিসেবে উল্লেখ করেছিল-কোনো কোনো দল আবার তিনটি একসঙ্গেই বলেছিল। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে-নির্বাচন বা সরকার গঠন-সংক্রান্ত কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দল গণ-ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে একেবারে খাণ্ডব দাহনের পণে সোচ্চার হয়েছিল।

তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরেক সংকট-আদর্শিক ঐক্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে বাকশাল গঠনের যৌক্তিকতা নিরূপণে যেটা আলোচনার দাবি রাখে। স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় নিষিদ্ধ থাকলেও সাম্প্রদায়িক ও একাত্তরের পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সুযোগসন্ধানী অপতৎপরতা যেমন বন্ধ রাখেনি, তেমনি এসব দলের নেতাদের রাজনৈতিক দেনদরবারও থেমে থাকেনি। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসেই প্রকাশ্য রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছিল দালাল আইনে আটক ও পরে মুক্তিপ্রাপ্ত সাবেক কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা খাজা খয়েরুদ্দিনের। ৩০ জানুয়ারি দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি সাক্ষাৎকার। ওই সাক্ষাৎকার থেকেই বেআইনি ঘোষিত সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উদ্যোগে রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা এসেছিল। প্রস্তাবিত এ নতুন দলের আহ্বায়ক কমিটির কনভেনর করা হয়েছিল নুরুল ইসলাম চৌধুরীকে। তবে খয়েরুদ্দিনের বক্তব্য অনুযায়ী, এ দল গঠনের উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ২ ডিসেম্বর ঢাকার ইসলামিক একাডেমিতে আয়োজিত এক সমাবেশে। ২৫০ জন প্রতিনিধির ওই সমাবেশ সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা অব্দি চলেছিল। এ সভা থেকেই ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছিল, যারা ১৩ জানুয়ারি (১৯৭৪) পুনরায় সভায় মিলিত হয়ে আরও কয়েকজনকে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করেছিল। এ দলের প্রতি রাজাকার খান এ সবুর ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. মালিকের সমর্থন যেমন ছিল, তেমনি নেতৃত্বে ছিল খাজা খয়েরুদ্দীন।

রাজনৈতিক ঐক্য-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সে সময় মুক্তিসংগ্রামের আদর্শকেই মূল ধরা হয়েছিল-ফলে একদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গণ-ঐক্যজোট এবং অন্যদিকে ছিল এ জোটবিরোধী বিভিন্ন দল। ফলে স্পষ্টতই এখান থেকে বাকশালের তাত্ত্বিক কাঠামোটি নির্ণয় করা সম্ভব। পরবর্তী সময়ে বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফফর) জাতীয় দলে যোগ দেয়। এরপর অবশ্য আরও অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সংগঠনও যুক্ত হয়েছিল।

চতুর্থ সংশোধনী: সাংবিধানিক ইতিহাসের ডেসডিমোনা

সংসদে চতুর্থ সংশোধনী বিল উত্থাপনের আগে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল ও কার্যনির্বাহী কমিটির যৌথ সভাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। বাকশাল নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেছেন, প্রত্যেকেই এ সভার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সভায় দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বঙ্গবন্ধু প্রায় চল্লিশ মিনিট বক্তব্য রাখেন। ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে একমাত্র ইত্তেফাক পত্রিকাই শিরোনাম করে 'সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের সম্ভাবনা'। বস্তুত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধু দলের এ জরুরি সভা ডেকেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন শাসনতন্ত্রের গণমুখী আমূল সংস্কার। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পড়লে বোঝা যায়, তৎকালীন বাস্তবতায় এর বিকল্প আর কী হতে পারত? বুদ্ধিজীবীগণ বাকশালকে নেতিবাচক একটি ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করলেন, কিন্তু তৎকালীন আর্থসামাজিক বাস্তবতায় আজ এত বছরেও তারা একটি বিকল্প সমাধানের সন্ধান দিতে পারলেন না।

গত সাড়ে চার দশকের অধিক সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক-বেসামরিক আমলা-অর্থাৎ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এ চতুর্থ সংশোধনী। যে আলোচনা-সমালোচনা চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে হয়েছে বা

এখনো হয়, তার সিকি ভাগও যদি পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কে হতো; তাহলে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের হত্যাকারীদের দায়মুক্তি ঘটত না বাংলার মাটিতে। অসাম্প্রদায়িক চেতনানির্ভর বাংলাদেশের ওপর রাষ্ট্রধর্মের ভূত চেপে বসত না অন্যায়ভাবে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রথম (প্রজাতন্ত্র) ও দ্বিতীয় (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) ভাগে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) ৪৪, অর্থাৎ মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ শীর্ষক অনুচ্ছেদে যে পরিবর্তনটি আনা হয়েছিল -তাতে নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলো সমুন্নত রাখতে বাহাত্তরের সংবিধানে যেখানে সুপ্রিম কোর্টে মামলা রজু করার কথা বলা হয়েছে , চতুর্থ সংশোধনীতে সেটি সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কমিশন গঠন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনীর এ অংশের সমালোচনায় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'বহুদিন যাবৎই এ ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে প্রযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে আদালতের অধিকার ছিল ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত' । তিনি আদালতের সাংবিধানিক নয়, ঐতিহ্যগত অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন, যা একটি জরুরি অবস্থাকালীন রাষ্ট্রের পরিস্থিতি উন্নয়নে আদতে কোনো ভূমিকা রাখে না। কারণ, পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, সে সময়ে বাংলাদেশের আদালতগুলোতে মামলার দীর্ঘ জটের কারণে বিচারের গতিও ছিল অত্যন্ত শ্লথ। ১৯৭৫ সালের ২৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে জানা যায়, 'সারাদেশে সাড়ে ১১ লাখ মামলা বিচারাধীন...অথচ নিম্ন ও উচ্চ আদালতে কিঞ্চিদধিক সাত শত বিচারক রহিয়াছেন।'

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, স্বাধীন দেশের মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার খর্ব হচ্ছিল, কারণ বিচারাধীন মামলার তুলনায় আদালত ও বিচারক যেমন কম; তেমনি বিচারপ্রক্রিয়াতেও স্বচ্ছতা নেই। বাকশাল এ প্রসঙ্গে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

১০২ অনুচ্ছেদ ছাড়াও সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের (বিচার বিভাগ) প্রথম (সুপ্রিম কোর্ট) এবং দ্বিতীয় (অধস্তন আদালত) পরিচ্ছেদভুক্ত মোট ছয়টি অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন বা সংশোধন করা হয়েছে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। এর মধ্যে ৯৫ অনুচ্ছেদের (বিচারক নিয়োগ) এক নম্বর দফা সংশোধনপূর্বক 'প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন' প্রতিস্থাপিত হয় । বর্তমান সংবিধান অনুসারে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃকই নিযুক্ত হন- বাহাত্তরের সংবিধানের বিধানও তা-ই । বাহাত্তরের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) প্রথম পরিচ্ছেদভুক্ত (রাষ্ট্রপতি) ৪৮ (৩) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলেন, তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে (প্রধান বিচারপতি নিয়োগসহ) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেবার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল। চতুর্থ সংশোধনী অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে 'প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ' করার বিধানটি রহিত করে। একই বিধান রহিত করা হয় ৯৮ অনুচ্ছেদে-অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের যেকোনো বিভাগে (হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ) সাময়িকভাবে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে।

এখন যে প্রেক্ষাপট ও রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় আপৎকালীন সমাধান হিসেবে চতুর্থ সংশোধনী করা হয়েছিল, আমার মতে-এতে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা হয়নি; বরং বিপদাবস্থা থেকে উত্তরণের একটি সমাধান বের করা হয়েছিল। কারণ বিচারক স্বল্পতার যে প্রভাব বিচার বিভাগের ওপর পড়ছিল, তাতে জনগণ এ বিভাগের প্রকৃত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এখন কোনটা আগে-সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা নাকি জনগণের বিচার পাবার অধিকার?

নিবিড়ভাবে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীটি পাঠ করলে বোঝা যায়, এ সংশোধনী প্রসঙ্গে সিংহভাগ আইনজ্ঞের আপত্তির জায়গাটি মূলত নিজেদের আভিজাত্যবোধ। বিচার বিভাগের ক্ষমতা সংকুচিত করার যে অভিযোগ চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে তোলা হয়-আমার মতে- তা একপেশে এবং খানিকটা ভাবাবেগপ্রসূত। কারণ, চতুর্থ সংশোধনীর পর আজ পর্যন্ত সংবিধানে আরও তেরোটি সংশোধনী এসেছে। জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে বিচার বিভাগের নাকের ডগার সামনে দিয়ে। সংবিধানের মৌল কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক

বহু বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ অনুচ্ছেদ, ধারা, দফা-উপদফা দিয়ে বিভিন্ন সংশোধনী আনা হয়েছে, কিন্তু আমাদের বিচার বিভাগ বা আইনজ্ঞ বুদ্ধিজীবীগণ এ নিয়ে আলোচনা করতে চান না। আমাদের বিচার বিভাগকে অবৈধ স্বৈরশাসকরা নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেছে।

আগেও বলেছি-বাকশালসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা এ ছোট্ট পরিসরে সম্ভব নয়। আমি কেবল গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে এটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে বাকশাল সম্পর্কে যে বক্তব্যগুলো বহুল পঠিত বিভিন্ন গ্রন্থ বা বঙ্গবন্ধুবিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতাতে শোনা যায়, তা সর্বৈব সত্য নয়। কিছু কথার সার থাকলেও, সুগভীর আলোচনায় গেলে সেগুলো যুক্তিতে টেকে না। ফলে বাকশালসম্পর্কিত সত্য ভাষণগুলো উঠে আসে না। এর প্রথম কারণ এ-সংক্রান্ত গবেষণা একেবারে নেই বললেই চলে; দ্বিতীয় কারণ, জন-মানসিকতায় পরিকল্পিতভাবেই বাকশাল সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে রাখা হয়েছে। ফলে এ নিয়ে আলোচনায় খোদ আওয়ামী লীগের অনেক নেতৃবৃন্দই বিব্রতবোধ করেন।

কিন্তু কার্যত বাকশাল ছিল তৎকালীন পরিস্থিতিতে সংকট নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এর কতগুলো দিক ছিল স্বল্পমেয়াদি-গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায়-সংকট কেটে গেলে হয়তো ভবিষ্যতে সেগুলো বিলোপ করা হতো। কিন্তু এতে অনেকগুলো বিষয় ছিল-যেগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও গণমুখী। কেবল কেতাবি তত্ত্ব দিয়ে তো আর গণমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বাকশালের মাধ্যমে একটি জন-সম্পৃক্ত ও স্বাদেশিকতায় ঋদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

আজকের দিনের বাস্তবতায় বাকশাল প্রযোজ্য কি না-তার জন্য স্বতন্ত্র গবেষণা প্রয়োজন। কোনো রাজনৈতিক মতবাদই সর্বজনীন হতে পারে না। আজকের পৃথিবীর সংকটে মার্কসবাদই বা কতখানি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে? সুতরাং এ বিতর্ক চলবেই-এবং চলাই উচিত। কিন্তু বিতর্কে অংশ নেবার আগেই একটি রাজনৈতিক তত্ত্বকে প্রজন্মের সামনে নেতিবাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা অপরাধের শামিল। সেই অপরাধীদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু গবেষণার নিষ্ঠায় বাকশালের প্রকৃত তত্ত্ব ও শক্তিটি বের করে আনতে পারলে, তাদের উচিত জবাব দেওয়া যাবে।

তথ্যসূত্র

হাসিনা, শেখ, মওদুদ, বেবী (সম্পা.), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ৪৪।

সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, সমাজ বদলের ব্লু– প্রিন্ট, অনন্যা, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ২৪।

বাংলাদেশ গণপরিষদ বিতর্ক (সরকারী বিবরণী), ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

"বাংলার স্বাধীনতা নস্যাতের জন্য ভুট্টো মাসে ২৬ লাখ টাকা ব্যয় করে", বাংলার বাণী, ০৩ মার্চ ১৯৭৩, প্রথম ও শেষ পাতা।

"প্রশ্নোত্তরে জাসদ নেতৃবৃন্দ: বাংলাদেশে বিদেশী সৈন্য রয়েছে", দৈনিক গণকণ্ঠ, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৪, প্রথম ও শেষ পাতা।

"প্রশাসন যন্ত্র", বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩।

"দেশের বর্তমান জরুরী সমস্যাবলী মোকাবিলায় সকল পর্যায়ে ত্রিদলীয় জাতীয় কমিটি", দৈনিক বাংলা, ৩০ মে ১৯৭২, প্রথম ও সপ্তম পাতা।

"খাজা খয়েরুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎকার: নতুন দল হচ্ছে: নাম রিপাবলিকান পার্টি", দৈনিক সংবাদ, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭৪, প্রথম ও সপ্তম পাতা।

"সমস্যা উত্তরণের মত ও পথ নিয়ে আলোচনা", দৈনিক (রবিবারের) পূর্বদেশ, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৫, প্রথম পাতা।

"সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের সম্ভাবনা", দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৫, প্রথম পাতা।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৮ নম্বর আইন)- এর ১৮ ধারামতে পরবর্তীতে প্রতিস্থাপিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২, তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার), ৪৪ (১) ও (২), পৃ. ১৪।
সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ২ নং আইন), ধারা: ৩।
আহমদ, মওদুদ, বাংলাদেশ: শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, অনুবাদ আলম, জগলুল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ. ৩২০-২১।
"বিচারের নয়া ব্যবস্থা", দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ১৯৭৫, সম্পাদকীয়, দ্বিতীয় পাতা।
সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ২ নং আইন), ধারা: ১৩।
সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪ নম্বর আইন)-এর ৩০ ধারাবলে পরবর্তীতে প্রতিস্থাপিত।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২, ষষ্ঠ ভাগ (বিচার বিভাগ), প্রথম পরিচ্ছেদ (সুপ্রীম কোর্ট), ৯৫ (১), পৃ. ৪৩।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২, চতুর্থ ভাগ (নির্বাহী বিভাগ), প্রথম পরিচ্ছেদ (রাষ্ট্রপতি), ৪৮ (৩), পৃ. ১৭।

৪৪, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৪৮৩১৪৯০১, ০২-৪৮৩১৮৮৬৭
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৪৮৩১৮০৪৩
info@dhakatimes24.com

বিজ্ঞাপনের জন্য: ad.dailydhakatimes@gmail.com
নিউজের জন্য: dhakatimes24@yahoo.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০১২ - ২০২৪ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার সম্পূর্ণ বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ